# ধাতুর অক্সাইড নরম যখন

সৌম্যজিৎ রায়

‘খাইসে অ্যাও কি ব্যাদে আসে নাকি!‘ বেদে হয়তো নেই তবে একটু বিষম খাওয়ারই মত কথা বটে। ধাতু বলতে আমরা বুঝি ভীষণ শক্তপোক্ত জিনিস। যেমন, অইতিঝ্যির কথা বললে, মনে আসে সেই কুতুব মিনারের সামনের মস্ত মরচে না পড়া স্তম্ভটা। মরেচে! মরচে! সেটাও তো শক্ত। সেটা অবশ্য ধাতু না তার অক্সিজেনতুতো ছেলে: ধাতুর অক্সাইড। আগেই বলে রাখা ভালো, এরা সবাই, মানে রসায়নের সব চরিত্রগুলো অনেকটা চরিত্তিরহীনই। আর কি ধাতু কি অক্সিজেন, বালাই ষাট! তাদের চরিত্রের কথা কম বলাই ভালো, কারণ, তাদের কাজই এখানে ওখানে মিলে মিশে সন্তান-সন্ততির জন্ম দেওয়া। আর তাদের সেই প্রচন্ড সৃষ্টিস্পৃহা থেকেই জন্ম এই বস্তুময় জগতের। বিচিত্র সেই বস্তুময় জগৎ। আর সেই বস্তুময় জগতের কিছু নিয়ম মেনেই কোনো কিছুর কঠিণ বা নরম হওয়া। গল্প শুরুর আগেই অনেক নতুন চরিত্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, কম করে তিনটে, ধাতু, অক্সিজেন আর ধাতুর অক্সাইড। এবার ধাতুর অক্সাইডের কঠিণ বা নরম হওয়া বোঝার আগে এদের সঙ্গে হাল্কা আলাপ করে নেওয়া যাক।

আসি ধাতুর কথায়। ধাতু বলতে মনে আসে শক্ত কিছু। ঠণ ঠণ শব্দ। তড়িৎ পরিবহণ। দামী গয়না, মুদ্রা। আচ্ছা তরল ধাতু? মন অতীতচারী হয়। তুলে আনে ছোটোবেলার জ্বরে জড়ানো দিনগুলো। থার্মোমিটার। তার ভেতরে থাকা তরল ধাতু, পারদ। পারদ তরলও বটে। নরমও বটে। কিন্তু কেন? উঁকি দেবো ছোট্টো ছোট্টো অণু, পরমাণুর জগতে। অণুগুলো সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার হয়ে আছে। অনেকটা বালির বালিয়াড়ীর মত। একোণে একটা ঠেলা দিতে অন্যকোণে ঠেলা লাগার একটা সম্ভাবনা আছে মাত্র! কেবল সম্ভাবনা! আর তাই নেই কোনো নির্দ্দিষ্ট আকার। এক মুঠো বালির আবার আকার কি! তবে হ্যাঁ। পরমাণুগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাই তরল। আর তরল, তাই নরম ও বটে। তবে, কিছু শক্তির নিয়মে পরমাণু বা অণুগুলোকেও থাকতে হয় অল্প জায়গাতে নির্দ্দিষ্ট ভাবে। আর তাই, পারদের থার্মোমিটার ভাঙলে, একোণের পারদের গুলি গড়িয়ে সেকোণে ছোটে। তার ওপর পারদ বিষাক্ত। সব মিলিয়ে এক হুলুস্থুল কাণ্ড! আবার চোখ সরিয়ে আসি বড়দের জগতে।

একটা ছোট্টো তামার সিকে। ঠুক করে তাতে ঠোকা দিতেই একটা টুক করে শব্দ হল। আবার একটা হাল্কা ঠেলা দিলাম। একটা জায়গা থেকে গড়িয়ে গেল আরেকটা জায়গায়। কিন্তু তামার সিকে রইলো সেই সিকেই। তার আকার আকৃতির কোনো তারতম্য নেই। সে যে কঠিন! তামায় অণুগুলো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে। আঁটো-সাটো জায়গা। মাঝে তিল ধারণের জায়গা নেই। একটা কোণায় একটু ঠোকা দিতেই কিছুই হেল দোল নেই সেই সব অণুদের। বড় জোর একটা হাল্কা শব্দ হল। কিন্তু পারদের থার্মোমিটার ভাঙলে, পারদের গুলি গড়িয়ে ছোটে! সে এক কান্ড!

একটু সজাগ থাকলে এখানে একটা ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে। পারদ তরল ধাতু মানলাম। তবে যে প্রায়ই টিভিতে ভেসে আসে আরেক ধরণের ছবি। গলা সোনা বা গলা লোহার লাভার মত প্রবাহ। প্রবাহ মানেই তো তরল। মানেই তো নরম। তবে সেই নরম ধাতুর টিমে তো পারদ পারতপক্ষেই একা নয়। কোথায় যেন একটা অমিলে সুর কাটছে। সুর কাটছে তাপমাত্রাকে অলক্ষে উপেক্ষা করায়। ধাতুর অণু বা পরমাণুগুলো কতটা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে, কতটা আঁটো-সাটো সে জায়গা, সবই অনেকটা নির্ভর করে তাপমাত্রার ওপর। তাপমাত্রা বাড়ার অর্থ, সেই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকা এক ধাক্কায় ছড়িয়ে দেওয়া। সেই ধাক্কায় পরমাণু অণুগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। হয় ধাতুর তরল হওয়া। এও যেন ফ্রিজ থেকে বরফ বের করে ফেলে রাখলে বরফ গলে জল হওয়ার সামিল। কাজেই গহণের প্রশ্নটা, ধাতু কখন তরল নয় বরং, আমাদের চারপাশের তাপমাত্রায় ধাতু কখন তরল! আর সেখানেই পারদ অনেকটা ‘ক্লাব-ক্লাশ-ক্যাটাগোরী‘র!

এবার আসি অক্সিজেনের কথায়। অক্সিজেন বলতে আমাদের মনে আসে এক অদৃশ্য গ্যাস, খোলা বাতাস, মুক্ত আঙিনা! অক্সিজেন অনেকটা বিজ্ঞানের বিশেষ কবিতার মত। প্রাণের পরশমণি হয়ে সে জাগিয়ে রেখেছে জীবনের আপামর দহণ। অক্সিজেনের দহণে জীবনের স্পন্দন, তার আধিক্যে বনের দাবানল, অবর্তমানে

মৃত্যু! হাতে-হাত ধরে থাকা দুটো পরমাণু আমাদের ফুসফুসে এসে রক্তে বয়ে চলেছে কোষে কোষে। দহণ-দানে পূর্ণ মুক্ত করছে খাদ্যে থাকা শক্তির আধার। নিজে রূপান্তরিত হচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইডে। ধারণ করছে জীবন। সবই গ্যাসের আকারে। অর্থাৎ, অণুগুলো রয়েছে একেবারে এলোমেলো হয়ে এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কিন্তু তরল অক্সিজেন কি সম্ভব? অবশ্যই এক হল তাপমাত্রা কমিয়ে, আর একভাবেও তা সম্ভব, যা প্রথম দেখিয়েছিলেন ইংরেজ বিজ্ঞানী অ্যানড্রু। তবে তিনি দেখিয়েছিলেন অক্সিজেন নয়, বরং কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়ে। তিনি গ্যাসীয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে তার ওপর ক্রমশঃ চাপ বাড়িয়ে তাকে তরল করে দেখিয়েছিলেন যে এভাবেও তরল গ্যাস পাওয়া সম্ভব। যদি এখন অণুর বীক্ষণে মন দিই, তবে দেখবো যে যত চাপ বাড়ছে তত, মুক্ত বিশৃঙ্খল অণুদের মধ্যে একটা একটা করে দল তৈরী হচ্ছে। সেই দলগুলো আরো কাছাকাছি এসে অনেকটা আবার সেই ঢিপির বালিয়াড়ীর মত আকার নিচ্ছে। বালির আকার তরল জলের মত। মুঠো ভরা হাতে নিলে আস্তে আস্তে হাতের ফাঁক দিয়ে গলে যায়। অর্থাৎ চাপে পড়লে বিশৃঙ্খল অণুদের দল হয়ে ওঠে অনেকটা সুশৃঙ্খল তরল। তাই তাপ আর চাপে অবস্থার বদল হয়। সে হোক না ধাতু কি হোক না অক্সিজেন। তাহলে ধাতুর অক্সাইড যে বিশেষ অবস্থায় তরল হবে তাতে আর সন্দেহ কি!

তবে ধাতুকে নরম এমনকি তরল অবস্থাতে অনেকটা অজান্তেই হয়তো নিয়ে গেছিলেন পুরোনো দিনের ইয়োরোপীয় কাচ-শিল্পীরা। বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রথম তরল সোনা তৈরী করেন বিখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে। তাঁর তৈরী করা সেই সোনা আজো রাখা আছে রয়্যাল ইনস্টিটিউশানে। আসলে এই রকম তরল বা নরম ধাতুর মূলসুরটুকু বেশ সহজ ও সুন্দর। সোনাকে কাটতে কাটতে যখন একদম মাত্র কয়েকটা সোনার পরমাণুর একত্রিত দানায় ভাঙা হয়, আর বাকিটা থাকে জল, তখন সোনার প্রকৃতি আর শক্ত আমাদের চেনা সোনার মত থাকে না। তার রঙ হয় অনেকটা গোলাপী আর তা বইতে থাকেও জলের মত। সেই সোনায় সোনার কণাগুলোর ব্যাস এক মিটারের কোটি ভাগের এক ভাগ। আর এই পরিমাপ বিজ্ঞানের পরিভাষায়

ন্যানোমিটারে। তাই এই সোনা আজকের জনপ্রিয় মহলে সোনার ন্যানোকণা বা ন্যানোগোল্ড বলেই পরিচিত। সুপ্রাচীণ ইয়োরোপীয় শিল্পীরা এই ন্যানোগোল্ড এর তরলকে চার্চের জানলায় রঙ হিসেবে ব্যবহার করেন। একইভাবে আমাদের চেনা পরিবেশে তরল বা নরম ধাতুর ব্যবহার ছিল এবং আছেও। আর নরম বলতে আমরা কি বুঝি? ফরাসী বিজ্ঞানী পিয়ের দ্য' জিনের কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, এই অবস্থায় পদার্থের সংগঠক কণাগুলোর সীমাটা অনেকটাই অপরিষ্কার, বিস্রস্ত। যেমন করে মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলোর সীমা অনেকটাই নরম, ঠিক তেমন করেই। অথচ কঠিণ অবস্থাতে পদার্থের সংগঠক কণাগুলোর সীমাটা একদম পরিস্কার স্পষ্ট, অনেকটা চীনের প্রাচীরের মতই সুস্পষ্ট এবং প্রকট। তাই সোনার তরল ন্যানো অবস্থায় সে কেবল তরলই নয়, নরমও বটে।

চিত্র- ১: রয়্যাল ইনস্টিটিউশানে রাখা ফ্যারাডের সোনার তরল ন্যানোকণার বোতল। ইনসেটে সোনার ন্যানোকণার মাইক্রোস্কোপে তোলা ছবি।

আসি ধাতুর অক্সাইডের কথায়। ধাতু আর অক্সিজেন মিলে মিশে তৈরী করে ধাতুর অক্সাইড। কিন্তু সেও বেশীরভাগ সময়েই কঠিণ। অন্যভাবে বলতে গেলে, ধাতুর অক্সাইডের সংগঠক কণাগুলোর সীমাটা একদম পরিস্কার স্পষ্ট, অনেকটা চীনের প্রাচীরের মতই সুস্পষ্ট এবং প্রকট। একটু অণুবীক্ষণে মন রাখলে দেখবো যে এখানে, ধাতুর অক্সাইডের সংগঠক অণুগুলো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে, আঁটো-সাটো সে জায়গা। আর এখানেই আসে এক খুব প্রতিস্পর্ধী প্রশ্ন। আচ্ছা আমরা মানে যারা জীবন্ত, আমরা তো সবাই কম বেশী তরলই নয় কি? প্রশ্ন ওঠে প্রকৃতি যদি গঠণগত বৈচিত্র্যের জন্য জীবনের গঠণগত একক (যেমন, কোষ) যদি তরল বা নরম অবস্থা চয়ন করে থাকেন, তবে ধাতুর অক্সাইডে গঠণগত বৈচিত্র্য পাওয়ার জন্যও আমাদের সেইরকমভাবে নরম ধাতুর অক্সাইড তৈরী করতে হবে! এদের আমরা একটা পোশাকী বিজ্ঞানসম্মত নামও দিয়েছি: সফট অক্সোমেটালেটস বা SOMs। এখন প্রশ্ন হল কিভাবে রসায়ণের রান্নাঘরে বানাবো আমরা এই সফট অক্সোমেটালেটস বা SOMs?

প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে চোখে আবার তুলতে হবে অণুর চশমা। দেখতে হবে ধাতুর অক্সাইডের গঠণ অণুর নিরিখে। তবে তারো আগে দেখে নিতে হবে কিছু জ্যামিতিক গঠণ একটু কাছে থেকে। একটা বর্গক্ষেত্র। তার চারটে কোণকে দুটো রেখায় যুক্ত করে চারটে ত্রিভুজ আঁকা হল। এবার মাঝের বিন্দুকে মনে মনে টেনে কাগজের পাতা থেকে তুললে তৈরী হয় একটা পিরামিড তবে যার ভূমিটা বর্গক্ষেত্র। এমনি দুটো পিরামিডকে বর্গক্ষেত্র বরাবর আঠা দিয়ে মনে মনে আঁটলে তৈরী হয় একটা অক্টাহেড্রন। ধাতব অক্সাইডগুলোর অণুর গঠণ এই রকম অসংখ্য অক্টাহেড্রন আর পিরামিডের সমন্বয়। আর এইসব অক্টাহেড্রন আর পিরামিডের কেন্দ্রে থাকে ধাতুর পরমাণু আর তাদের কোণগুলোতে থাকে অক্সিজেন আর আর এভাবেই তৈরী হয় ধাতুর অক্সাইড। কঠিণ অবস্থায় এই অক্টাহেড্রন আর পিরামিডেরা থাকে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে। এখন প্রশ্ন কিভাবে এই কঠিণ অবস্থার ধাতুর অক্সাইড থেকে রসায়ণের রান্নাঘরে আমরা বানাবো সফট অক্সোমেটালেটস বা SOMs?

১৯৫০ এর দিকে আরেক বৃটিশ বিজ্ঞানী জন কেগিন এক ধরণের অণুর গঠণ ব্যাখ্যা করেন যা ধাতুর অক্সাইডে তৈরী। এই অণুর দুই অংশ, একটা মাঝের ফসফেটের ($PO_4$) পিরামিড আর তাকে ঘিরে থাকা ১২ টা ধাতব (মলিবডেনাম) অক্সাইডের অক্টাহেড্রা বা $(MoO_3)_{12}$। এর রসায়ণে একটা খটোমটো পোশাকী নাম আছে: $PMo_{12}O_{40}$ বা $(PO_4)(MoO_3)_{12}$ । যার মানে একটা $PO_4$ আর ১২ টা $MoO_3$ হাত ধরাধরি করে বসে আছে। কিন্তু এদের মধ্যে বেশ কিছুটা অপছন্দ। তাই একটু সুযোগ পেলেই এরা হাত ছেড়ে তৈরী করবে শুরুর $PO_4$ আর $MoO_3$। এই হাত ছাড়াছাড়ির মাঝে কি হতে পারে কোনো সুন্দর সংগঠণ? আর তা দেখতে আমরা রসায়ণের রান্নাঘরে সাজিয়েছিলাম সফট অক্সোমেটালেটস তৈরীর একটা ছোট্টো পরীক্ষা। (চিত্র ২)

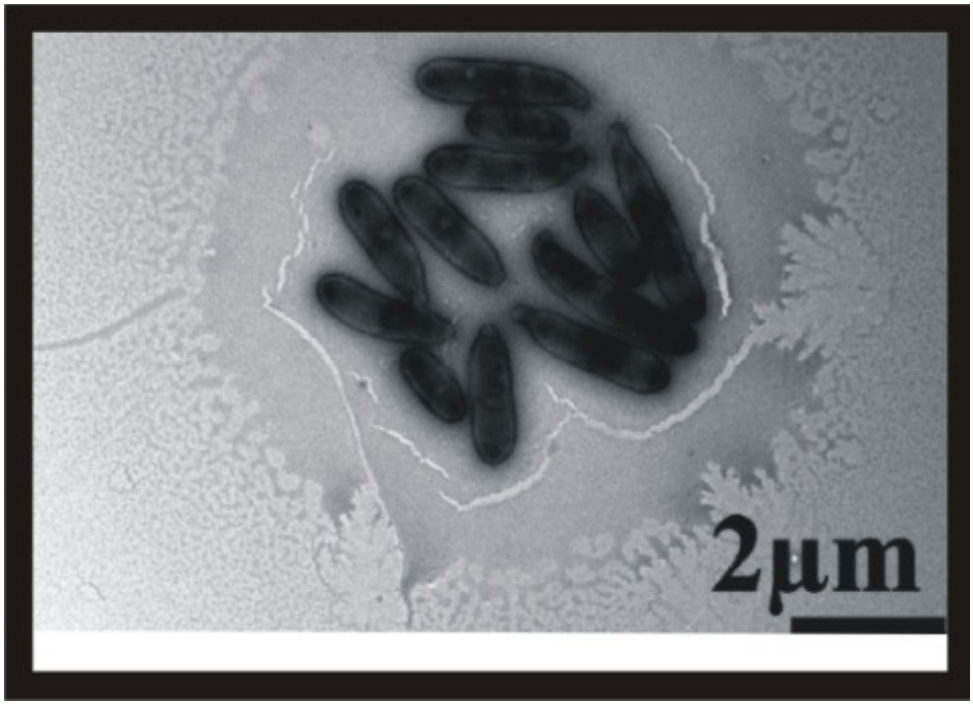


চিত্র ২: অণু সাজিয়ে তৈরী মাইক্রোস্কোপে দেখা সফট অক্সোমেটালেটস অজৈব মটরশুঁটি।

পরীক্ষাটা অনেকটা এরকম। $PMo_{12}O_{40}$ বা $(PO_4)(MoO_3)_{12}$ এ একটা $PO_4$ কে ঘিরে ১২ টা $MoO_3$ বসে আছে। $PO_4$ আর $MoO_3$ এর মধ্যে বেশ কিছুটা অপছন্দ। কি হয় যদি হয় হাত ছাড়াছাড়ি? কিভাবেই বা হতে পারে এই হাত ছাড়াছাড়ি? আর সেই রেশেই 'ন্যানো আর ম্যাক্রো'র মাঝের অঞ্চলে কি করে আমাদের স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত অণু, তা দেখতে আমরা শুধু উস্কে দিলাম একটা ভৌত-রাসায়ণিক সংগ্রাম। কি দিয়ে? শব্দের ব্যবহারে। অর্থাৎ, একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ধরে এক বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘের শব্দ ওই অণুর এক জলীয় সংমিশ্রণে বেশ কিছুক্ষণ চালাতেই দেখা গেল ন্যানোমিটার দৈর্ঘ্যের অণু নতুন করে সেজে উঠল অনেকটা অজৈব মটরশুঁটির মত করে! [এখানে বলে রাখা ভালো, ন্যানো আর ম্যাক্রো দুয়েরই জন্ম দৈর্ঘ্য বোঝানোর একক থেকে। ন্যানো বা ন্যানোমিটার, এক মিটারের প্রায় দশ কোটি ভাগের এক ভাগ! আর ম্যাক্রো বলতে বোঝায় অন্ততঃ মাইক্রোমিটার বা তার বেশী। মাইক্রোমিটার আবার এক মিটারের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ।] এর কারণ? $PMo_{12}O_{40}$ বা $(PO_4)(MoO_3)_{12}$ এর $PO_4$ আর $MoO_3$, শব্দ শক্তির সাহায্যে নড়ে চড়ে অজৈব মটরশুঁটির মত সফট অক্সোমেটালেটস তৈরী করে। (চিত্র ২)। যেখানে, $PO_4$ মটরদানায় বাসা বাঁধে আর তার চারপাশে তাকে জড়িয়ে থাকে $MoO_3$। কারণ: $PO_4$ এর পছন্দ গোল মটরদানা, আর $MoO_3$ চায় তার থাকে থাকে সাজানো ক্রিস্টালের সুন্দর পরিবেশ। এ যেন, অণুরই এক রূপান্তরিত পরিবর্তন। এক সজ্জার রূপান্তর। সাজানো ফসফেটের পিরামিড আর তাকে ঘিরে থাকা ১২ টা ধাতব (মলিবডেনাম) অক্সাইডের অক্টাহেড্রার সাজানো পরিবেশ থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মটরশুঁটির পরিবেশ। সেখানে নেই গা ঘেঁষা অণুগুলোর অবস্থান তার পরিবর্তে আছে তরলের আল্গা পরিবেশ। দ্য জিনের কথায়, এখানে প্রাচীরও বিস্রস্ত, নরম। তাই ধাতুর অক্সাইড হলেও এরা নরম আর তাই সফট অক্সোমেটালেটস। আর এরা ধাতুর অক্সাইডের মত স্থির নয়, বরং বহমান, যেন অনেকটা জীবন্ত আর দেখতেও এরা অনেকটা জীবন্ত ব্যাক্টেরিয়ার মত, কি জীবন্ত কোষের মত (চিত্র ২)! আর এখানেই আমরা প্রশ্ন রাখলাম, আচ্ছা এদের কি জীবন্ত বাহনের মত করে চালনা করা সম্ভব? আর তা দেখাতেই আমরা বেছে নিলাম আলোর চিমটে বা অপটিক্যাল ট্যুইজারস।

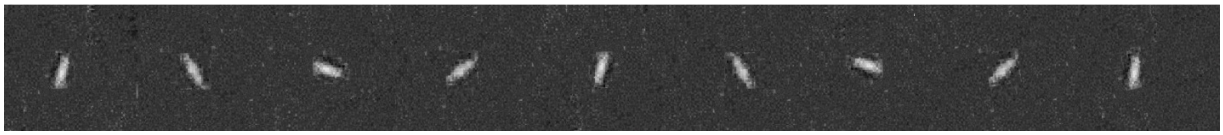

চিত্র ৩: আলোর চিমটের মাইক্রোস্কোপে দেখা জীবন্ত জিনিসের মত ঘুরতে থাকা সফট অক্সোমেটালেটস মটরশুঁটি।

আসি আলোর চিমটের কথায়। আলো যখন কোনো কিছুর ওপর পরে, তখন আমরা স্কুলে পড়েছি যে তার নিয়তি তিনটে। প্রতিফলন, প্রতিসরণ আর বিচ্ছুরণ। আমরা এও জানি যে আলো অসংখ্য ছোট্ট ছোট্ট কণার সমষ্টি। বিজ্ঞানের পোশাকী পরিভাষায়, সেই কণাগুলোর নাম ফোটন। আলো যখন কোনো স্বচ্ছ বস্তুর মধ্যে দিয়ে যায়, তখন প্রতিসরণের জন্য আলোর রশ্মি কিছুটা বেঁকে যায়। এর ফলে আলোর ওপর যেমন বস্তুটা বলপ্রয়োগ করে ঠিক তেমন করেই নিউটনের তৃতীয় সূত্র মেনে আলো ও বা বলা ভালো আলোর ফোটন কণাগুলোও বস্তুটার ওপর বল প্রয়োগ করে। কিন্তু এই বলের মান ও খুব কম, তা প্রায় মাধ্যাকর্ষণ বলের ১০০ কোটি ভাগের এক ভাগ। তাই আলোর মধ্যে সাধারণ আকারের অনেক কোটি গুণ কম, যেমন আমাদের নরম ধাতুর অক্সাইডের মটরশুঁটি, তেমন বস্তুর ওপর এই বলের আপাতঃ মানও বেশ তুলনামুলকভাবে বেশী। এ যেন অনেকটা অ্যালিসের ওষুধ খেয়ে ছোট্টটি হয়ে ছোট্ট আঘাতেও বড় ধাক্কা খাওয়ার সামিল! অত ছোট সফট অক্সোমেটালেটসের ওপর আলোর বলের প্রভাব আমাদের ওপর মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবেরই প্রায় সমতুল্য। আর কাজেই দুদিক থেকে প্রতিসারিত আলোর বলে একটা বাটির মত শক্তির খাঁচায় আটকে আলোর চিমটেতে ভাসতে থাকে ওই নরম ধাতুর অক্সাইডের সফট অক্সোমেটালেটসের মটরশুঁটি। এই পরীক্ষাগুলো আইসারে আমরা করেছি আমাদের বন্ধু বিজ্ঞানী অধ্যাপক আয়ন ব্যানার্জীর সঙ্গে। এরপর অয়ন মডেল করে দেখান যে কেবল ভাসিয়ে আটকে রাখা নয়, এই নরম ধাতুর অক্সাইডের সফট অক্সোমেটালেটসের মটরশুঁটি আকারের জন্য আর আলোর ফোটন কণাগুলোর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কৌণিক ভরবেগের জন্য মটরশুঁটিগুলোকে জীবন্ত জিনিসের মত সমানে ঘোরাতে পারা সম্ভব! আর ঠিক সেভাবেই আমরা আজ সফট অক্সোমেটালেটসের মটরশুঁটিকে

আলোর চিমটেতে ফেলে ঘোরাতেও পেরেছি এখানে (চিত্র ৩)। তাই শুধু নরমই নয়, যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এসব সফট অক্সোমেটালেটসগুলো!

একটা ল্যাবোরেটারীর কোণ। সে কোণে একটা বোতলে রাখা কিছু তরল, নরম ধাতুর অক্সাইড, নিজেরাই গড়িয়ে যাচ্ছে আলোর চিমটের দিকে। ভেসে আসছে কিছু ক্ষীণ শব্দ। কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, 'খাইসে, মামু আইসে! সল গিয়া বোতল লগে ঢুইক্যা পড়ি! অ্যাও ব্যাদে সিলো নাকি, আমরাও একদিন সিবন্ত হইমু!'

*সৌম্যজিৎ আই আই এস ই আর (বা আইসার) কলকাতার রসায়ণ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। লেখাটিতে গঠণমূলক আলোচনার জন্য লেখক অধ্যাপক অয়ন ব্যানার্জীর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।*

তথ্যসূত্র:

1. Linus Pauling, The Nature of the Chemical Bond and the Structure of Molecules and Crystals: An Introduction to Modern Structural Chemistry, Cornell University Press, Ithaca, 1960.

2. P. G. de Gennes, Soft Interfaces, Cambridge University Press, 1997.

3. C. N. R. Rao, G.U. Kulkarni, P. J. Thomas and P. P. Edwards, Chem. Soc. Rev., 2000,29, 27.

4. S. Roy, M. T. Rijneveld-Ockers, J. Groenewold, B. W. M. Kuipers, H. Meeldijk, and W. K. Kegel, Langmuir 2007, 23, 5292.

5. S. Roy, Comments on Inorganic Chemistry, 2011, 32, 113.